হয়, কাজেই হাত উঁচু করেছি। আর কেউ হাত তুলছে না। তোলার কথাও না--খুব কঠিন অঙ্ক। এখন একটা সমস্যা দেখা দিল। কেউ যদি হাত না তোলে তাহলে অঙ্ক স্যার আমাকে বলবেন বোর্ডে এসে অঙ্কটা করে দিতে। বিরাট সমস্যা হবে। আমি চট করে হাত নামিয়ে ফেললাম। অঙ্ক স্যার হুংকার দিলেন, 'হাত তুলে নামিয়ে ফেললি কেন? অঙ্ক হয় নাই।'

'জ্বি না স্যার।'

'দেখি খাতা নিয়ে আয়।'

খাতা নিয়ে গেলাম। স্যার খাতা দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই তো হয়েছে। হাত নামালি কেন? সত্যি কথা বল, নয় তো পাঁচ নম্বুরী বেত দিয়ে কেরামতি দেখিয়ে দেব।'

আমি চুপ করে রইলাম। এই শীতেও ঘাম বেরিয়ে গেল। বুক শুকিয়ে কাঠ।

বশির বলে একটা ছেলে আছে আমাদের ক্লাসে। খুব বজ্জাত। তার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে বিপদে ফেলা। যদি কোনো স্যার বেত আনতে বলেন--বশির আনন্দে হেসে ফেলে। বিনয়ে গলে গিয়ে বলে, 'স্যার আমি নিয়ে আসি।'

যদি কোনো ছেলেকে নীলডাউন করে রাখা হয়, বশিরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে--সে বড় মজা পায়।

আজও তাই হল। যেই সে দেখল অঙ্ক স্যার পাঁচ নম্বুরী বেতের কথা বললেন, ওম্নি সে বলল, 'ও স্যার মুনিরের খাতা থেকে টুকলিফাই করেছে। আমি দেখেছি।'

স্যারের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বশির দাঁত বের করে বলল, 'বেত নিয়ে আসি স্যার?'

'যা নিয়ে আয়।'

'কয় নম্বর আনব স্যার?'

'পাঁচ নম্বুরী আন। দেখ আজ কেরামতি কাকে বলে।'

বশির লাফাতে লাফাতে বেত আনতে গেল। অঙ্ক স্যার মুনিরকে

জিজ্ঞেস করলেন, 'হুমায়ূন তোর খাতা থেকে টুকেছে?'

মুনির তার স্বভাবমতো চুপ করে রইল। হ্যাঁ না কিছুই বলল না। মুনির ক্লাসে কখনো কথা বলে না।

'কথা বল, নয়তো আজ তোর কেরামতিও বের করব। ব্যাটা মৌন বাবাজী, কথা বলে না। কথা বল। নয়তো তোর একদিন কি আমার একদিন।'

মুনির উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ততক্ষণে বশির

'কয় নম্বর আনব স্যার?'

চলে এসেছে। আনন্দে সে ঝলমল করছে।

অঙ্ক স্যার গম্ভীর গলায় বললেন, 'দু' জনই পঁচিশ ঘা করে বেত খাবি। কত ধানে কত চাল বের হয়ে যাবে। ক্লাস সিক্সে পড়ে, এর মধ্যেই খাতা দেখে লেখা শিখে গেছে। মামদোবাজি! আরেক জন দরবেশ মৌনী বাবা। দেখি হাত পাত। দুই হাত।'

আমি হাত পাতলাম। বশির আনন্দে ফিক করে হেসে ফেলল। আমি অবশ্যি খুব ব্যথা পেলাম না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখলে আর হাত শক্ত করে রাখলে বেশি ব্যথা পাওয়া যায়। আমি ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম আর হাত খুব নরম করে ফেললাম।

মুনিরের কোনো শাস্তি হল না। হবে না আমি জানতাম। কারণ ও খুব ভালো ছেলে। গভারের ইংরেজি কি তা সে চট করে বলে দিতে পারবে। শুদ্ধ বানানে। অবশ্যি মুখে বলবে না। খাতায় লিখে দেবে। ওর একটাই দোষ--কথা বলে না। এই দোষের জন্যই তার শাস্তি হয় না।

অঙ্ক স্যার একটা বক্তৃতা দিলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে শারীরিক শাস্তির তিনি ঘোর বিপক্ষে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দিলেন, কারণ অপরাধ গুরুতর। ক্ষমার অযোগ্য। এই বয়সে যে টুকলিফাই করে, বড় হয়ে সে কী করবে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে যেতেই বশির চিকন গলায় বলল, 'পঁচিশ ঘা বেত দেয়ার কথা স্যার, আপনি মাত্র তেরটা দিয়েছেন। বারটা বাকি রইল স্যার।'

বশিরটা এমন বজ্জাত! রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই। হজম করতে হবে। সুযোগমতো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ফুটবলের মাঠে বেকায়দা ল্যাং মেরে ফেলে দিতে হবে। কিংবা লাল পিঁপড়ার বাসা মাথায় টুপির মতো পরিয়ে দিতে হবে।

আমাকে শাস্তি দিয়ে অঙ্ক স্যারের বোধ হয় মনটা খারাপ হয়েছে। কারণ তিনি দেখি মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছেন। অন্য সময় হলে এতক্ষণ বোর্ডে চলে যেতেন এবং ঝড়ের মতো একটির পর একটি অঙ্ক করতে থাকতেন। আমাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকত না।

টপাটপ খাতায় তুলতে হত। আজ সে রকম কিছু হচ্ছে না। স্যার আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। চিৎকার চেঁচামেচি করলেও স্যারের মনটা খুব নরম। কোনো ছেলের অসুখ হয়েছে শুনলে তিনি তার বাসায় যাবেন। বাজখাঁই গলায় বলবেন, 'কী যে যন্ত্রণা করিস, আবার অসুখ বাধালি। তাড়াতাড়ি ভালো হ। নয়তো চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।'

মুনির এখনো দাঁড়িয়ে। শাস্তির অপেক্ষা করছে। বেশ ভয়ও পেয়েছে। অল্প অল্প কাঁপছে। অঙ্ক স্যার বললেন, 'তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস।'

মুনির বসল। আড়চোখে কয়েকবার তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'এই হুমায়ুন, ভূত পুষবি?'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কি! ভূত পুষব মানে? ভূত কি কুকুরছানা নাকি?

মুনির ফিসফিস করে বলল, 'আমি আজ সন্ধ্যায় একটা ভূতের বাচ্চা আনতে যাব।'

'ভূতের বাচ্চা আনতে যাবি মানে! ভূতের বাচ্চা পাওয়া যায় নাকি?'

'এক জন আজ আমাকে একটা ভূতের বাচ্চা দেবে। সন্ধ্যার সময় যেতে বলেছে। তুই যাবি?'

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। মুনিরটা এমন আগ্রহ করে তাকাচ্ছে। আমার মার খাওয়া দেখে হয়ত তার মায়া লেগেছে। এখন আমাকে খুশি করতে চায়।

'হুমায়ুন যাবি?'

'যাব।'

'খবরদার কাউকে বলবি না।'

'আচ্ছা বলব না।'

কোনো কথা কাউকে না বলে থাকা কষ্টের ব্যাপার। তখন কথাটা পেটের মধ্যে বড় হতে থাকে। পেট গুরগুর করে। খুব অস্বস্তি হয়। এই জন্যে কোনো কথা বেশিক্ষণ পেটে রাখতে নেই। খুব গোপনীয়

কথাগুলি বটগাছকে বলে পেট হালকা করতে হয়। বটগাছ সেই কথা কাউকে বলতে পারে না বলে আর কেউ জানতে পারে না।

স্কুল ছুটির পর আমরা রওনা হলাম। ব্রহ্মপুত্রের পাড় ধরে-ধরে অনেক দূর যেতে হল। কেওটখালির কাছাকাছি এসে নদী পার হলাম। শীতকাল, কাজেই পানি বেশি নেই। খেয়া-নৌকা আছে। দশ পয়সা করে নেয়। মুনির পয়সা দিয়ে দিল। সন্ধ্যা এখনো হয় নি। এর মধ্যে চারদিক অন্ধকার। গাছপালার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। এক সময় দোতলা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। গাছপালায় ঢাকা জঙ্গুলে জায়গায় শ্যাওলা-ঢাকা এক বাড়ি। লোহার গেট। সেই গেটে বাড়ির নাম লেখা-- "শান্তিনিকেতন"। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'কোথায় নিয়ে এলি? এটা কার বাড়ি?'

'আমার এক আত্মীয়-বাড়ি। দূর সম্পর্কের নানা হয়।'

'এই লোকই তোকে ভূতের বাচ্চা দেবে?'

'হুঁ।'

'গুল ছেড়েছে।'

'না, গুল ছাড়ে নি।'

'কি করে বুঝলি গুল ছাড়ে নি?'

'চেহারা দেখলে তুইও বুঝবি। সন্ন্যাসীর মতো চেহারা। সন্ন্যাসীরা কি গুল ছাড়ে?'

অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাবার পর যিনি দরজা খুললেন, তাঁকে দেখে আমি অবাক। অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিক সে রকম লম্বা দাড়ি। সাদা বাবড়ি চুল। লম্বা এক জন মানুষ। পরনে আলখাল্লার মতো লম্বা একটা পোশাক। গলার স্বরও কী গম্ভীর!

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়। সঙ্গে এটি কে?'

'আমার বন্ধু। এও ভূতের বাচ্চা নেবে।'

'আমি কি দোকান দিয়ে বসেছি নাকি, যে-ই আসবে একটা করে ভূতের বাচ্চা দিয়ে দেব? একটা দেব বলেছিলাম, একটা পাবি। ভেতরে এসে বস।'

আমরা সিঁড়ি ভেঙে দোতলার একটা ঘরে ঢুকলাম। সেই ঘরে বই ছাড়া আর কিছুই নেই। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই আর বই। মাঝখানে একটা ইজিচেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। ইজিচেয়ারের পাশে ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলে একটা অদ্ভুত ধরনের টেবিল ল্যাম্প। উনি বোধ হয় এখানে বসেই বই পড়ছিলেন।

'তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস। মেঝেতে পা ছড়িয়ে বস। নাকি মেঝেতে বসলে তোদের মান যাবে?'

আমরা পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়লাম। আমার একটু ভয়ভয় করছে।

'কিছু খাবি তোরা?'

'জ্বি না।'

'ভূতের বাচ্চা যে নিবি, কোনো পাত্র এনেছিস?'

মুনির না-সূচক মাথা নাড়ল।

'ভূতের বাচ্চা যে নিবি
কোনো পাত্র এনেছিস?'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কিছু নিয়ে আসিস নি, তাহলে নিবি কী করে? পকেটে করে তো আর নিতে পারবি না। ভূত হচ্ছে হাওয়ার তৈরি। আচ্ছা দেখি ঘরে কিছু আছে কিনা।'

তিনি আমাদের বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। বুঝতে পারছি বাড়িটা অনেক বড়। অনেকগুলি ঘর। কিন্তু এই ঘরটি ছাড়া অন্য কোনো ঘরে বাতি জ্বলছে না। লোকজনেরও কোনো সাড়া নেই। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না?'

'না।'

'ওঁর নাম কি?'

'আগে অন্য নাম ছিল। এখন ওঁকে রবিবাবু বলে ডাকতে হয়। রবি-বাবু না ডাকলে রাগ করেন। আমি ডাকি রবি নানা।'

'উনি করেন কি?'

'কিছু করেন না। শুধু বই পড়েন আর কবিতা লেখেন।'

'কবিতা লেখেন কেন?'

'নোবেল প্রাইজ দরকার তো, এই জন্যে কবিতা লেখেন। কবিতা না লিখলে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায় না। তুই আর কথা বলিস না তো। চুপ করে থাক। বেশি কথা বললে উনি রাগ করেন।'

আমি চুপ করে গেলাম। ভদ্রলোক ঢুকলেন হাতে ছোট্ট একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি নিয়ে। ভূতের বাচ্চা কি উনি এর মধ্যে ভরে দেবেন? কী সর্বনাশ!

'বোতল একটা পাওয়া গেছে, গরম পানিতে ধুতে হবে। সময় লাগবে।'

আমি কিছু বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, 'এত ছোট বোতলের মধ্যে থাকবে?'

আমার কথায় ভদ্রলোক অত্যন্ত রেগে গেলেন। চোখ বড়বড় করে বললেন, 'ছোট একটা কলসির মধ্যে যদি বিশাল দৈত্য থাকতে পারে, হোমিওপ্যাথির শিশির মধ্যে ভূতের বাচ্চা থাকতে পারবে না?'

আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলোক ধমকের সুরে বললেন, 'জবাব

দাও--পারবে কি পারবে না?'

'পারবে।'

'হুঁ, দ্যাটস গুড। কী নাম তোমার?'

'হুমায়ূন।'

'ক্লাস সিক্সে পড়?'

'জ্বি।'

'রোল নাম্বার কত?'

'বত্রিশ।'

'ক্লাসে ছাত্র কত জন?'

'বত্রিশ।'

'তার মানে পড়াশোনা কিছুই পার না?'

'জ্বি না।'

'স্কুল ভালো লাগে না?'

'জ্বি না।'

'রবি ঠাকুরেরও স্কুল ভালো লাগত না। তাই বলে তুমি মনে করো না যে তুমি রবি ঠাকুর।'

'আমি মনে করি না।'

'গুড। এখন বল তো আমার চেহারাটা রবি ঠাকুরের মতো না?'

'জ্বি।'

'মুশকিল হচ্ছে কি জান? টাক পড়ে যাচ্ছে। টাকওয়ালা রবীন্দ্রনাথ অসহ্য, তাই না?'

আমরা কিছু বললাম না। ভদ্রলোক আমাদের রেখে হোমিওপ্যাথির শিশি হাতে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। আমি মুনিরকে বললাম, 'তোর এই নানা কি পাগল?'

'না, পাগল হবে কেন?'

'কেমন কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।'

মুনির কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল, কারণ ভদ্রলোক আবার এসে ঢুকেছেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিতে হলুদ রঙের

ধোঁয়াটে কি একটা জিনিস।

'সাবধানে রাখবি। মুখ গালা দিয়ে সীল করে রেখেছি। খবরদার, সীল ভাঙবি না। মাঝে মাঝে চাঁদের আলোতে রাখবি। এরা চাঁদের আলো খায়। ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে বোতল হাতে নিয়ে হাঁটবি। এরা টাটকা বাতাস পছন্দ করে।'

আমি বললাম, 'বোতলের ভেতর তো বাতাস যাবে না।'

ভদ্রলোক কড়া গলায় বললেন, 'এই ছেলে তো বেশি কথা বলে। শোন ছোকরা, কথা কম বলবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন বাড়ি চলে যাও। যাবার আগে একটা কবিতা শুনে যাও। টাটকা কবিতা। আজ বিকেলে লিখেছি। দু' ঘন্টা মতো হয়েছে। এখনো বাসি হয় নি। ছ' ঘন্টার আগে কবিতা বাসি হয় না। শুধু গরম কালে তিন ঘন্টাতেই বাসি হয়।'

আমরা চুপচাপ বসে আছি। রবি নানা পকেটে হাত দিয়ে কবিতা লেখা কাগজ বের করলেন। মাথা দুলিয়ে পড়তে শুরু করলেন,

"আমাদের ছোটনদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু
পার হয় গাড়ি।
দুই ধার উঁচু তার।
ঢালু তার পাড়ি।"

কবিতাটা আমার বেশ ভালো লাগল। তবে কেন জানি মনে হতে লাগল আগেও পড়েছি।

'কবিতাটা কেমন?'

'খুবই ভালো।'

'ব্রহ্মপুত্র নিয়ে লেখা। আচ্ছা, যাও এখন, বাড়ি যাও। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

ভূতের বাক্সা নিয়ে আমরা চলে এলাম। আমার বারবার মনে হতে

লাগল এটা সত্যি নয়। কোথাও মস্ত একটা ফাঁকি আছে। মুনিরের একটা হাত পকেটে। সেই হাতে সে নিশ্চয়ই বোতল ধরে আছে। একবার সে ক্ষীণ গলায় বলল, 'কেমন জানি গরম-গরম লাগছে।'

ব্রহ্মপুত্রের পাশ দিয়ে আসছি। নদীর উপর ক্ষীণ চাঁদের আলো। আমাদের কেন জানি বেশ ভয়ভয় করতে লাগল। মুনির ফিসফিস করে বলল, 'বোতলটার ভেতর ঐটা নড়াচড়া করছে রে।'

'ভয় লাগছে?'

'হুঁ।'

'আমার কাছে দিয়ে দে। সকালবেলা নিয়ে নিবি। দিনের আলোয় আর ভয় লাগবে না।'

মুনির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শিশিটা দিয়ে দিল। প্যান্টের পকেটে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি সত্যি সত্যি একটু যেন গরম গরম লাগছে।

বাসায় এসে ভয়াবহ দুঃসংবাদ শুনলাম। অঙ্ক স্যার নাকি সন্ধ্যার পর এসেছিলেন। আমি এখনো ফিরি নি শুনে খুব রেগে গেছেন। বলে গেছেন আবার আসবেন।

অঙ্ক স্যারের এই হচ্ছে একটা বদ অভ্যাস। হঠাৎ হঠাৎ সন্ধ্যার পর ছাত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হন। বাজখাঁই গলায় বলেন, 'কি, পড়াশোনা হচ্ছে কেমন? দেখি পাটীগণিতটা আন তো।'

আমাদের বাড়িটা বেশ অদ্ভুত।

এই বাড়িতে দু' দল মানুষ থাকে। ছোট আর বড়। ম্যাট্রিক ক্লাসের নিচে যারা তারা সবাই ছোট। আর ম্যাট্রিক ক্লাসের উপরে হলেই বড়।

যত যন্ত্রণা ছোটদের। সন্ধ্যা হতে–না–হতেই তাদের পড়তে বসতে হবে। পড়তে হবে চেঁচিয়ে, যাতে সবাই শুনতে পায়। পড়ার সময় বড়রা কেউ–না–কেউ থাকবেই। এদের একটামাত্র কাজ––একটু পরপর ধমক দেয়া।

এ বাড়ির ছোটদের মধ্যে আছি আমি এবং আমার দুই ছোট ভাই। এরা বেশি ছোট। এক জন টুতে পড়ে। অন্যজন স্বরে অ স্বরে আ করে আর বইয়ের পাতা ছেঁড়ে। বড়দের দলে আছে বাবা, মা, আমার বড়চাচা এবং বড়চাচার মেয়ে অরু আপা। অরু আপা কিছুদিন আগেও ছোটদের দলে ছিল। ম্যাট্রিক পাশ করায় এখন বড়দের দলে চলে গেছে। ফার্স্ট ডিভিশন আর চারটা লেটার পাওয়ায় খুব দেমাগ হয়েছে।

আজ পড়া দেখিয়ে দিচ্ছে অরু আপা। রোজ সন্ধ্যায় সে খানিকক্ষণ আমাদের পড়া দেখিয়ে দেয়। অরু আপা এম্নিতে খুব ভালো মেয়ে––হাসিখুশি, কিন্তু পড়া দেখাতে গেলেই সে কেমন জানি হয়ে যায়। মুখ কঠিন, গলার স্বর থমথমে আর এমন ভাবে তাকায়, যেন এক্ষুণি এসে আমাকে কামড় দেবে। আজ পড়ছি জলবায়ু। অরু আপা বলল, 'মৌসুমী বায়ু কাকে বলে?' আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'ঠান্ডা এবং মোলায়েম বায়ুকে মৌসুমী বায়ু বলে। এই বায়ু গায়ে লাগলে খুব আরাম। তবে বেশি লাগলে সর্দি হবার সম্ভাবনা। যাদের টনসিলের দোষ আছে তাদের মৌসুমী বায়ু গায়ে লাগান উচিত নয়।'

অরু আপা হাত উঁচিয়ে বলল, 'একটা চড় দেব।'

'আমাকে চড় দিলে তুমিও খামচি খাবে।'

'ফাজিল।'

'তুমিও মহিলা ফাজিল।'

অরু আপা রাগে কিড়মিড় করতে করতে সত্যি একটা চড় বসিয়ে দিল। আমিও খামচি দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, ঠিক তখনি বাবা এসে বললেন, 'এই হুমায়ূন তুই বাইরে আয়। তোর স্যার এসেছে––অঙ্ক স্যার।'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। অরু আপাকে খামচি দেয়া গেল না। তার উপর আবার অঙ্ক স্যার এসে বসে আছেন। পড়া ধরবেন কিনা কে জানে।

'সন্ধ্যাবেলা কোথায় ছিলি?'

অঙ্ক স্যার মেঘগর্জন করলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোনো কথা না বলাই এখন নিরাপদ।

'আমাকে চড় দিলে তুমিও খামচি খাবে।'

'সত্যি কথা বল। মিথ্যা বললে তোকে পুঁতে ফেলব। বেয়াদপের ঝাড়। সন্ধ্যাবেলা ঘুরে বেড়ান! বল, কোথায় ছিলি?'

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, 'ভূতের বাচ্চা আনতে গিয়েছিলাম স্যার।'

'কী বললি!'

'এক জনের কাছ থেকে একটা ভূতের বাচ্চা আনতে গিয়েছিলাম।'

'এনেছিস?'

'জ্বি।'

'কোথায়?'

'আমার পকেটে স্যার।'

অঙ্ক স্যার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নাক ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। ভীষণ রেগে গেলে স্যারের এ রকম হয়। আমি খুব ঘামতে লাগলাম। না জানি কী হয়!

'ভূতের বাচ্চা আনতে গিয়েছিলি?'

'জ্বি স্যার।'

'কোথায় সেই ভূতের বাচ্চা?'

'পকেটে স্যার। প্যান্টের পকেটে।'

'বের কর।'

আমি বের করলাম। ছোট্ট হোমিওপ্যাথির শিশি, গালা দিয়ে মুখ বন্ধ করা। ভেতরে ধোঁয়াটে একটা কিছু।

'এই তোর ভূতের বাচ্চা?'

'জ্বি স্যার।'

'আজ আর কিছু বললাম না। এই সব আজেবাজে জিনিস বিশ্বাস করার জন্যে কাল কঠিন শাস্তি হবে। কাল তুই তোর ভূতের বাচ্চা নিয়ে স্কুলে আসবি। দেখবি পাঁচ নম্বুরী বেতের কেরামতি।'

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কাল যা হবার হোক, আজ রাতটায় তো নিস্তার পাওয়া গেল। এই বা কম কি?

ভূতের কথা শুনে বাড়িতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সবাই ভূতের বাচ্চা হাতে নিয়ে দেখতে চায়। দেখতে চাইলেই তো হাতে দেয়া যায় না। হয়তো ফট করে হাত থেকে ফেলে দেবে।

একমাত্র অরু আপাই ভূতের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাল না। অরু আপা সায়েন্সে পড়ে। যারা সায়েন্সে পড়ে তাদেরকে সব কিছুই অবিশ্বাস করতে হয়। কাজেই সে ঠোঁট উল্টে বলল, 'ভূত না ছাই। খানিকটা ধোঁয়া বোতলে ভরে দিয়ে দিয়েছে। নীল রঙের ধোঁয়া।'

নীল রঙের ধোঁয়া শুনে আমার খটকা লাগল। ব্যাপারটা কী, নীল রঙের ধোঁয়া বলছে কেন? আমি তো একটু আগে দেখলাম হলুদ।

ও মা, কী কাণ্ড! বোতল হাতে নিয়ে একেক জন একেক রঙ বলতে লাগল।

বড়চাচাও অবাক হয়ে গেলেন। চোখে চশমা পরে অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা রহস্যজনক। আমি খয়েরী রঙ দেখতে পাচ্ছি। এর মানেটা কি?'

বড়চাচার কথায় সবার গা ছমছম করতে লাগল। আমার দাদী কেঁদে উঠলেন, 'কী অলক্ষুণে কাণ্ড! ভূতের বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছে। এই হুমায়ূন, যা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এই ছেলেকে গরম পানি দিয়ে গোসল করাও। লবণ খাওয়াও।'

অনেক রাতে বড়দের একটা মিটিং বসল। আমার বাবা বললেন, 'ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে একেক জন যে একেক রকম রঙ দেখছে এটা সত্যি।'

ছোটচাচা বললেন, 'ঘোড়ার ডিমটা রাস্তায় নিয়ে ফেলে দিলে ঝামেলা চুকে যায়।'

বড়চাচা তাতে রাজি না। তিনি আরো পরীক্ষা করতে চান। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল রাতের বেলা বোতলটা সিন্দুকে তালাচাবি দিয়ে রাখা হবে। আগামী কাল যা করার করা হবে। বিশেষ করে স্কুলের অঙ্ক স্যার যখন বলেছেন বোতল স্কুলে নিয়ে যেতে--সেটাই করা হোক।

পরদিন আমি বোতলটা স্কুলে নিয়ে গেলাম। ও মা! সবাই দেখি

বানিয়েছে।'

'হবে, শাস্তি হবে। আগে ভূতটা গিলে ফেলি, তারপর শাস্তি।'

পানি এসে গেল। অঙ্ক স্যার ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিলেন-- 'দেশটা কুসংস্কারে ডুবে আছে। এক জন হোমিওপ্যাথির শিশিতে ভূতের বাচ্চা ভরে এনেছে। অন্য সবাই তাই বিশ্বাস করছে। ছিঃ ছিঃ!'

বলতে বলতে স্যার বোতলের মুখ খুলে নিজের মুখে উপুড় করে ধরলেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে বললেন, 'গিলে ফেললাম। হল এখন? ভূতের বাচ্চা হজম।'

স্যার একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেন। আমরা অবাক হয়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। স্যার কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন এবং আবার একটি ঢেকুর তুললেন। তারপর আবার একটি।

আমার মনে হল স্যার কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ পেটে হাত বোলালেন। বোতলটা শুঁকে দেখলেন। এবং আবার বেশ বড় রকমের একটা ঢেকুর তুললেন। মনে হল তিনি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন।

বশির বলল, 'স্যার হুমায়ূনের শাস্তি দিলেন না?'

স্যার সেই কথা যেন শুনতেও পেলেন না। ঝিম ধরে চেয়ারে বসে রইলেন এবং একটু পরপর ঢেকুর তুলতে লাগলেন। সেদিন আর ক্লাসে কোনো অঙ্ক করা হল না।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বই নিয়ে বসার কথা। এটা হচ্ছে বড়চাচার কঠিন নিয়ম। তবে সব নিয়মেরই ফাঁক আছে। এই নিয়মের বেলাতেও তা সত্যি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা বড়চাচা রাজনীতি নিয়ে

আলাপ করবার জন্যে পাশের উকিল সাহেবের বাড়ি যান। সেই বাড়িতে যাওয়া মানে পাক্কা তিন ঘন্টার ধাক্কা। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। ঐ সব দিনগুলিতে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে বসার দরকার নেই। কিছুক্ষণ খেলাধূলা করা যায়। আমরা ছোটরা বড়চাচা ছাড়া কাউকে ভয় করি না। আমার ধারণা সব বাড়িতে এ রকম এক-আধ জন মানুষ থাকে যাদের সবাই ভয় করে, অন্যদের পাত্তাই দেয় না।

যাই হোক, বড়চাচা বাসায় নেই--উকিল সাহেবের বাসায় গেছেন, আর আমরা নতুন একটা খেলা বের করেছি। এই খেলার নাম-- 'পানি খেলা'। সবাই মগে করে পানি নিয়ে এ ওর গায়ে ছিটিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। খুবই মজার খেলা।

খেলা যখন তুঙ্গে, তখন খবর পেলাম অঙ্ক স্যার এসেছেন। সব সময় দেখেছি দারুণ আনন্দের সময়ই খারাপ ব্যাপারগুলি ঘটে। পৃথিবীটা এ রকম কেন কে জানে? পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলি যখন করা হয়, তখন নিশ্চয়ই শিশুদের কথা কেউ ভাবে নি। আমার ধারণা এই পৃথিবীর সব নিয়মকানুনই হচ্ছে শিশুদের কষ্ট দেবার নিয়ম।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। অঙ্ক স্যার বললেন, 'কী করছিলি?'

আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পড়ছিলাম স্যার।'

অঙ্ক স্যার বললেন, 'ভেরি গুড।' বলেই বিকট একটা ঢেঁকুর তুলে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। মনে হল বেশ লজ্জাও পেলেন। ঢেঁকুর কি ভূতের বাচ্চা গিলে ফেলার কারণে নাকি? হতেও পারে। গতকাল স্যার ক্লাসে আসেন নি। অঙ্ক স্যার ক্লাসে না আসার মানুষ না।

অঙ্ক স্যারকে কেমন রোগা রোগা লাগছে। মুখ শুকনো। চোখ লাল। মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে পারেন নি। গায়ে চাদর জড়িয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন এবং একটু পরপর ঢেঁকুর তুলছেন। একেক বার ঢেঁকুর তোলেন আর হতাশ একটা ভঙ্গি করেন। ফ্যাকাশে হাসি হাসেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেন।

'কেমন আছিস হুমায়ূন?'

'জ্বি স্যার ভালো। আপনার শরীরটা কি স্যার ভালো না?'

'উঁহু। গত রাতে ঘুম হয় নি।'

'কেন স্যার?'

স্যার ইতস্তত করে বললেন, 'না–মানে–ঐ দিন তোর বোতলের ঐ জিনিসটা গিলে ফেললাম, তারপর থেকে--মানে--'

'তারপর থেকে কী স্যার?'

'না, কিছু না। একটু পরপর ঢেঁকুর উঠছে। ভূতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আমি জানি। শারীরিক কোনো অসুবিধা হয়েছে আর কি।'

'জ্বি স্যার। ওষুধ খান, সেরে যাবে।'

'খেয়েছি তো। নাক্স ভমিকা এক ডোজ খেয়েছি। দুই শ' পাওয়ার। কমছে না তো। মনে হচ্ছে, আরো যেন বেড়েছে।'

'সত্যি নাকি স্যার!'

স্যার উত্তর না দিয়ে বড় রকমের একটা ঢেঁকুর তুললেন। সেই ঢেঁকুরের সঙ্গে পেটের ভেতরে বিচিত্র শব্দ হতে লাগল--'টপ টপাটপ! ঘুম!! গুরু রুরুরু র!!!' স্যার নিজেই সেই শব্দে বিচলিত। বিচলিত এবং হতভম্ব। তিনি চিকন গলায় বললেন, 'হুমায়ূন, যে লোক তোকে ভূতের বাচ্চা দিয়েছে ওর কাছে আমাকে নিয়ে চল তো।'

'কেন স্যার?'

'এমনি। যাই একটু গল্প করে আসি। ভূত–ফুত আমি বিশ্বাস করি না। ভূতের কথা বলে তিনি যে বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এটাও ঠিক না। বাসা চিনিস নে? আমাকে নিয়ে চল।'

'মুনিরকেও সাথে নিয়ে যাই স্যার? মুনিরের সঙ্গেই তাঁর ভালো চেনা–জানা।'

'দুনিয়াসুদ্ধ লোক নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার দেখি না। তুই গেলেই হবে।'

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বুড়ো লোকটি দরজা খুললেন।

আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়েই বললেন, 'এক মিনিট।' এই বলে পাশের ঘরের চলে গেলেন। খুটখুট শব্দ শোনা যেতে লাগল। যেন হামানদিস্তায় কিছু পিষছেন।

অঙ্ক স্যার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'দেখতে অবিকল রবি ঠাকুরের মতো না?'

'জ্বি স্যার।'

'আমি তো চমকেই গিয়েছিলাম।'

'প্রথম দিন আমিও চমকে গিয়েছিলাম স্যার।'

'খুটখুট শব্দ হচ্ছে কিসের রে?'

'জানি না স্যার। হয়ত ভূতের ভর্তা বানাচ্ছেন।

'ভূতের ভর্তা মানে? কী সব ছাগলের মতো কথা বলছিস!'

বুড়ো ভদ্রলোক ফিরে এলেন। হাতে গ্লাস ভর্তি লালাভ জিনিস। মুখ–ভর্তি হাসি। তিনি দরাজ গলায় বললেন, 'গ্লাসে কী আছে অনুমান করতে পারবে? চিরতার পানি। স্বয়ং কবিগুরু খেতেন। আমিও খাই। তোমাদের দু' জনকেই তুমি করে বললাম। বয়সে দু'জনই আমার চেয়ে ছোট। ছোটটাকে তো চিনি, আমার কাছ থেকে ভূতের বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিল। তুমি কে?'

স্যার কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি হুমায়ূনের শিক্ষক। অঙ্ক স্যার।'

'বাহ্ খুব ভালো তো। অঙ্ক ব্যাপারটা আমারও খুব ভালো লাগে। আচ্ছা তুমি মনেমনে দুই সংখ্যার একটা অঙ্ক ভাব। ভেবেছ?'

অঙ্ক স্যার শুকনো গলায় হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়লেন।

'এর সঙ্গে সাত যোগ দাও। দিয়েছ?'

'জ্বি।'

'যোগ দেবার পর যা হয় তা তুমি ১১০ থেকে বাদ দাও। দিয়েছ?'

'জ্বি।'

'খুব ভালো। এর সঙ্গে পনের যোগ দাও।'

'দিলাম।'

'যে সংখ্যা মনে মনে ভেবেছ তাও এর সঙ্গে যোগ কর। করেছ?'

'জ্বি করেছি।'

'দুই দিয়ে ভাগ দাও। এর থেকে নয় বাদ দাও। যা থাকল তাকে তিন দিয়ে গুণ দাও। দিয়েছ?'

'জ্বি।'

'তোমার উত্তর হল গিয়ে ১৫০--কি, হয়েছে?'

'জ্বি, হয়েছে। আশ্চর্য তো!'

অঙ্ক স্যার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'এই সব মজার মজার অঙ্ক করে ছাত্রদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হয়। তা না, কঠিন কঠিন সব অঙ্ক দিয়ে তোমরা ছাত্রদের ভয় পাইয়ে দাও। অঙ্ক একটা মজার জিনিস, তোমরা সেই মজাটাই ছাত্রদের দিতে পার না। খুব খারাপ। এখন বল আমার কাছে কী চাও?'

অঙ্ক স্যার বললেন, 'কিছু চাই না জনাব।'

বুড়ো খুব রেগে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'কিছু চাই না

'কেন ভূতের বাক্স গিললে?'

মানে? শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করতে এসেছ? আর একটু পরপর এমন বিশ্রী ঢেঁকুর তুলছ কেন? কী হয়েছে?'

অঙ্ক স্যারের মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল। আমার দিকে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'আপনি যে আমাকে ভূতের বাক্সটা দিয়েছিলেন, অঙ্ক স্যার সেটা গিলে ফেলেছেন। তারপর থেকে শুধু ঢেঁকুর উঠছে। স্যারের বড় কষ্ট।'

বুড়ো অবাক হয়ে বললেন, 'ভূতের বাক্স গিললে কেন। ভূত কি কোনো খাদ্যদ্রব্য? বল এটা কি কোনো মজাদার কিছু?'

স্যার আমতা আমতা করছেন। জবাব দিচ্ছেন না।

'কি, চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও। কেন ভূতের বাক্স গিললে?'

'ভূত বলে যে কিছু নেই এটা ছাত্রদের বোঝাবার জন্যে।'

'কিছু যদি না থাকে তাহলে তোমার পেটে যে জিনিসটা গজগজ করছে সেটা কী? বল কী সেটা?'

'না মানে অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে বোধ হয়।'

'অসুখ বিসুখ কিছু না। ভূতের বাক্স হজম হচ্ছে না। দাঁড়াও, দেখি কী করা যায়। নাকের ফুটো দিয়ে বের করে দিচ্ছি। সময় লাগবে। চট করে হবে না। পঞ্চাশটা বৈঠক দিতে হবে। তিন সের গরম পানি খেতে হবে। মুরগির পালক দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিতে হবে। তখন খুব হাঁচতে থাকবে। সেই হাঁচির সঙ্গে ভূত বেরিয়ে আসবে। অনেক যন্ত্রণা।'

আমরা দু' জন বাসায় ফিরে চলেছি। বুড়ো ভদ্রলোক ভূতের বাক্সটা বের করে আবার বোতলে ভরে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অঙ্ক স্যারের ঢেঁকুর তোলা বন্ধ হয়েছে। তবে তিনি খুব গম্ভীর। একবার শুধু বললেন, 'ব্যাপারটা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'তাহলে কি স্যার ভূত আছে?'

'আরে না, ভূত আবার কি? ঐ বুড়ো আমাদের বোকা বানিয়েছে।

ব্যাটা মনে হচ্ছে বিরাট ফাজিল।'

'কিন্তু স্যার আপনার ঢেঁকুর তো বন্ধ হয়েছে।'

স্যার কিছু বললেন না। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হল। যেন কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছেন না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে এক দারুণ ব্যাপার হল।

নাইন-টেনের ছেলেরা মিলে ঠিক করল, আম-কাঁঠালের ছুটি খানিকটা এগিয়ে দেবার জন্যে হেড স্যারের কাছে দরবার করবে। দরবারটা যাতে জোরাল হয় সে জন্যেই সব ক্লাস থেকে দু' জন করে যাবে। যে দু' জন যাবে তারা যেন অবশ্যই খুব ভালো ছাত্র হয়। ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া ছেলে হলে ভালো। স্যাররা ভালো ছাত্রদের ওপর চট করে রাগেন না।

দীপু হচ্ছে আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সে সব শুনে বলল, 'আগে-ভাগে ছুটি নিয়ে হবেটা কী? আম-কাঁঠালের ছুটি না হলেই সবচে ভালো হয়। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারি।'

কথা শুনে রাগে গা জ্বলে যায়। ইচ্ছা করে ঠাস করে মাথায় একটা চাটি বসিয়ে দিই। তার উপায় নেই, এরা ভালো ছাত্র। স্যারের কাছে নালিশ করলে সর্বনাশ।

আমাদের ক্লাস থেকে কেউ দেখি যেতে রাজি নয়। আমি একাই গেলাম। বিরাট একটা দরখাস্তও লেখা হল। ক্লাস টেনের বগা ভাই (আসল নাম বদরুল ইসলাম। খুব লম্বা বলে আমরা তাঁকে ডাকি বগা ভাই) হেড স্যারের হাতে দরখাস্ত তুলে দিল। হেড স্যার বললেন,

'ব্যাপার কি?'

বগা ভাই তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'দরখাস্তে সব লে-লে-লে-লেখা আছে স্যার।' বগা ভাইয়ের এই একটা অসুবিধা, ভয় পেলে তোতলাতে শুরু করে। এবং প্রতিটি বাক্য দু'বার করে বলে। সে আবার বলল, 'দরখাস্তে সব লে-লে-লে-লেখা আছে স্যার।'

'লেখা যে আছে তা তো দেখতেই পারছি। ব্যাপারটা কী তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'আম-কাঁঠালের ছুটি দুই সপ্তাহ এগিয়ে নিলে ভালো হয় স্যার।'

'কেন?'

আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। ছুটি এগিয়ে দিলে কেন ভালো হয়, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করি নি। হেড স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কথা বল।'

কেউ নড়াচড়া করছে না দেখে সাহসে ভর করে আমিই মুখ খুললাম। মিনমিন করে বললাম, 'এই বার তো স্যার গরম খুব বেশি পড়েছে, আম-কাঁঠাল সব আগে আগে পেকে গেছে। এই জন্যে স্যার ছুটিটা যদি এগিয়ে দেন।'

'আম-কাঁঠাল আগে আগে পেকে গেছে?'

'জ্বি স্যার।'

'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান কাকে বলে জানিস?'

'জ্বি না স্যার।'

'এক্ষুণি দেখবি কাকে বলে। কত বড় সাহস। বলে ছুটি এগিয়ে দিতে। যা ক্লাসে যা। ক্লাসে গিয়ে নীলডাউন হয়ে থাক।'

ক্লাসে ফিরে এসে নীলডাউন হয়ে আছি। বশির দাঁত বের করে হাসছে। কাউকে শাস্তি দিতে দেখলে তার ভারি আনন্দ হয়। সে আজ আর আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। কিছুক্ষণ পরপর সব ক'টা দাঁত বের করে দিচ্ছে।

টিফিন টাইমে দপ্তরী কালিপদ নোটিশ নিয়ে এল। হেড স্যার নোটিশ পাঠিয়েছেন-- "ছাত্রদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে এই বৎসরের গ্রীষ্মকালীন বন্ধের সময়সীমা দুই সপ্তাহ কমিয়ে দেয়া হল।

নির্ধারিত সময়ের দুই সপ্তাহ পর থেকে বন্ধ শুরু হবে। এই নিয়ে কোনো রকম দেন-দরবার না করবার জন্য ছাত্রদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।"

ছুটির পর খুবই মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। কী করা যায় কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন ছুটি এগিয়ে আনবার দরকার নেই; যথাসময় ছুটি আরম্ভ হলেই আমরা খুশি। তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আমাদের হেড স্যার খুব কঠিন চীজ।

সন্ধ্যার আগে আগে মুনির এসে উপস্থিত। সেও ছুটি কমে যাওয়ায় মন খারাপ করেছে। এই ছুটিতে তার মামাবাড়ি যাবার কথা। ছুটি কমে গেলে আর যাওয়া হবে না।

মুনির বলল, 'চল তাঁর কাছে যাই। তিনি যদি কোনো বুদ্ধি দেন।'

'কার কথা বলছিস?'

'আমাদের যিনি ভূতের বাচ্চা দিলেন। ঐ যে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে।'

'উনি বুদ্ধি দেবেন কেন?'

'দিতেও তো পারেন। আমাদের কথা তো উনি শোনেন। শোনেন না?'

'চল যাই। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনি হেড স্যারের মতো রেগে যাবেন। সব বড়রা এক রকম হয়।'

'তবু বলে দেখি।'

বুড়ো ভদ্রলোক দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে আমাদের সমস্যা শুনলেন। তারপর বললেন, 'অন্যায়, খুবই অন্যায়। ছুটি কমাবার কোনো রাইট নেই। বাচ্চা ছেলেগুলোকে সারাদিন স্কুলে আটকে রেখেও শখ মিটছে না, এখন আবার ছুটি কমিয়ে দিচ্ছে। রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে খুব রাগ করতেন।'

আমি বললাম, 'এখন আমরা কী করব বলুন।'

'ভূতের বাচ্চাকে বলা ছাড়া তো কোনো পথ দেখছি না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ভূতের বাচ্চাকে কী বলব?'

'তোমাদের সমস্যার কথা বলবে। কবে থেকে স্কুল বন্ধ করতে চাও এটা বলে দেবে, তাহলেই হবে।'

'কী যে আপনি বলেন!'

'কী যে আমি বলি মানে? এক চড় লাগাব, বুঝলে। যা করতে বলছি কর। বোতলটা মুখের কাছে এনে ফিসফিস করে বলবে। বলবে যেন আগামীকাল থেকেই আম-কাঁঠালের ছুটি দেবার ব্যবস্থা করে। খুব ভদ্রভাবে বলবে। আরেকটা কথা, মাসে একবারের বেশি কিছু চাইবে না, ভূত এখনো খুবই বাচ্চা। ক্ষমতা কম। আরেকটু বড় হোক, তখন ঘনঘন চাইতে পারবে।'

আমি বললাম, 'থ্যাংক ইউ।'

বুড়ো আগুন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে ইংরেজি? এর মানে কী?'

'ক্ষমা করে দিন স্যার। আর বলব না। আমরা এখন যাই স্যার?'

'না। আমি গতকাল একটা কবিতা লিখেছি, এটা শুনে তারপর যাও। তোমাদের নিয়েই লেখা।

কবিতার নাম "বীর শিশু"।

"মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চ'ড়ে
দরজা দু'টো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার "পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।"

আমার কেন জানি মনে হল এই কবিতাটা আগেও শুনেছি। তবে সেই কবিতাটার নাম ছিল বীরপুরুষ, বীরশিশু নয়। তবে এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি এখন না করাই আমার কাছে ভালো মনে হল। বুড়োকে রাগান ঠিক হবে না।

আমরা বাড়ি চলে এলাম। বুড়োর কথা ঠিক বিশ্বাস হল না। বোতলের ভেতর ভূত যদি থেকেও থাকে সে স্কুল বন্ধ করবে কী ভাবে?

তবু রাতে শোবার আগে ট্রাংক থেকে বোতল বের করে ফিসফিস করে বললাম, 'ভাই বোতল ভূত, তুমি কেমন আছ? ভাই তুমি কি আমাদের স্কুলটা আগামী কাল থেকে বন্ধ করে দিতে পারবে? লক্ষ্মী ভূত, ময়না ভূত। দাও না বন্ধ করে।'

অরু আপা কী কাজে যেন ঘরে ঢুকেছিল। সে অবাক হয়ে বলল, 'এসব কী হচ্ছে রে?'

আমি বললাম, 'কিছু হচ্ছে না।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'বোতলের ভূতের সঙ্গে।'

অরু আপা গম্ভীর হয়ে বলল, 'বোতলের ভূতের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল শুনি।'

'তোমার শোনার দরকার নেই।'

'আহা শুনি না।'

'বোতলের ভূতকে বলেছি আগামীকাল থেকে স্কুল বন্ধ করে দিতে। সে বন্ধ করে দেবে।'

'তোর মাথাটা খারাপ হয়েছে।'

'হলে হয়েছে।'

বাড়িতে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। বাবা ডেকে নিয়ে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে রে। তুই নাকি বোতলের ভূতকে বলছিস স্কুল বন্ধ করতে?'

বড়চাচা বললেন, 'পাজিটার কানে ধরে চড় দেয়া দরকার। ভূত-প্রেতের কাছে দরবার করছে। ভূত আবার কি রে? দশবার কানে ধরে ওঠ-বোস কর। আর যা, তোর সেই বিখ্যাত বোতল কুয়োয় ফেলে দিয়ে আয়। এক্ষুণি যা।'

বড়চাচার কথার উপর দ্বিতীয় কথা চলে না।

বোতল ভূত কুয়োয় ফেলে দিতে হল। পরদিন খুবই মন খারাপ করে স্কুলে গেলাম। এ্যাসেম্বলিতে সবাই দাঁড়িয়ে আছি। সোনার বাংলা গান হয়ে যাবার পর হেড স্যার বললেন, 'তোমাদের জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। স্কুলের জন্যে সরকার থেকে দুই লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। এখন তোমরা পাবে পাকা দালান। দালানের কাজ শুরু করতে হবে বর্ষার আগেই। কাজেই আজ থেকেই তোমাদের গরমের ছুটি। অন্যবারের চেয়ে এবার তোমরা দু' সপ্তাহ বেশি ছুটি পাবে। তবে ছুটিটা কাজে লাগাবে। শুধু খেলাধুলা করে নষ্ট করবে না।'

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্যাপারটা কি বোতল ভূতের কারণেই ঘটল?

'ভাই বোতলভূত, তুমি কেমন আছ?'

'জীবনে উন্নতি করতে চাস না?'

'না।'

বড়চাচা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'তোর বেআদবীর বিচার সন্ধ্যাবেলা হবে।'

সন্ধ্যাবেলা সত্যি সত্যি বিচার-সভা বসল। বড়চাচা, বাবা এবং আমাদের প্রাইভেট স্যার--তিন জন বসলেন তিন দিকে। আমি মাঝখানে। বড়চাচা স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুমায়ূন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি মাষ্টার বল তো।'

স্যার শুকনো গলায় বললেন, 'ওর মাথায় কিছু নাই।'

বড়চাচা ঠান্ডা গলায় বললেন, 'মাথায় কিছু নেই এই কথাটা তো মাষ্টার তুমি ঠিক বললে না। মাথায় ওর আছে গোবর। পচা গোবর।'

আমাদের স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'খুবই খাঁটি কথা বলেছেন। গোবর দিয়ে মাথা ভর্তি।'

'যে ভাবেই এসে থাক আমাকে বাঁচাও।'

বড়চাচা বললেন, 'তবে সাধনায় অনেক কিছু হয়। কবি কালিদাসেরও মাথাভর্তি ছিল গোবর। মহামূর্খ ছিলেন। সাধনার জন্যে পরবর্তীকালে হলেন--মহাকবি কালিদাস। কি বল মাষ্টার, ঠিক না?'

'একেবারে খাঁটি কথা।'

'কাজেই আমরা এখন দেখব সে যেন সাধনা ঠিকমতো করতে পারে। গরমের এই ছুটির মধ্যে হুমায়ূনকে আমরা ঠিকঠাক করে ফেলব। কি বল মাষ্টার?'

'খুবই ভালো কথা।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। বড়চাচা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন।

এখন আমি উঠি সূর্য ওঠার আগে। কিছুক্ষণ বড়চাচার সঙ্গে মর্নিং-ওয়াক করে পড়তে বসি। সেই পড়া চলে এগারটা পর্যন্ত। দুপুরের খাওয়ার পর শুরু হয় পাটীগণিত। বিকেল পাঁচটায় ছুটি। কাঁটায় কাঁটায় এক ঘন্টার ছুটি। ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরে বই নিয়ে বসতে হয়। রাত দশটায় ছুটি। কী যে কষ্ট! রোজ একবার কুয়োর সামনে গিয়ে বলি, 'বোতল ভূত, ও ভাই বোতল ভূত! বড়চাচার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও ভাই।'

কোনোই লাভ হয় না। ভূত হয়তো আমার কথাই শুনতে পায় না। কত নিচে পড়ে আছে, শোনার কথাও নয়। কিংবা কে জানে হয়তো বোতল ভেঙে গেছে। ভূতের বাচ্চা আর বোতলের ভেতর নেই। থাকলে সে নিশ্চয়ই আমার কষ্ট দেখে কিছু একটা করত।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন এক কান্ড হল। রাতে ঘুমুতে গেছি। শুতে গিয়ে দেখি পিঠের নিচে শক্ত কী যেন লাগছে। হাত দিয়ে দেখি--কী আশ্চর্য, ঐ বোতল। এখানে এল কী করে। কুয়োয় যে বোতল ফেলে দেয়া হয়েছে সেই বোতল এখানে এল কী করে।

ব্যাপারটা কী? ব্যাপার যা-ই হোক, তা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত বড়চাচার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমি খুব করুণ

গলায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললাম, 'ভাই তুমি কীভাবে এখানে এসেছ জানি না। যে-ভাবেই এসে থাক, তুমি আমাকে বাঁচাও। বড়চাচার হাত থেকে রক্ষা কর।' এই বলে আমি খানিকক্ষণ কাঁদলাম। এতে কোনো লাভ হবে ভেবে আমি বলি নি। তবু বলা তো যায় না। হতেও তো পারে।

পরদিন ভোরবেলা বই নিয়ে বসেছি। বড়চাচা ঢুকলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'চিন্তা করে দেখলাম ছুটির সময়টাতে ছুটি থাকা দরকার। রাতদিন বই নিয়ে পড়ে থাকলে ছেলেপুলে গাধা হয়। যখন স্কুল ছুটি থাকবে, তখন তোরও ছুটি। যা বই তুলে রাখ।'

আমি অবাক হয়ে বড়চাচার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমাদের আনন্দের এখন আর সীমা নেই।

বড়চাচার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আনন্দের প্রকাশ কী ধরনের হলে ভালো হবে, বুঝতে পারছি না। কী করা যায়? মুনির বলল, 'আমাদের ফুটবল ক্লাব ঠিকঠাক করে একটা ম্যাচ দিয়ে দিলে কেমন হয়?'

আমি বললাম, 'অতি উত্তম হয়।'

আমাদের ফুটবল ক্লাবের নাম হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। দু' বছর আগে আমরা ফুটবল ক্লাব শুরু করি। প্রথম বৎসর আমাদের কোনো বল ছিল না। কী করব, চাঁদা উঠেছে মাত্র আঠার টাকা। সেই আঠার টাকায় আমরা একটা ফুটবল পাম্প কিনি। আমাদের কান্ড দেখে অরু আপা হেসে বাঁচে না। একটা ছড়া বানিয়ে ফেলল।

'বল নেই আছে পাম্পার
সার্ট নেই আছে জাম্পার।।'

যাই হোক, পরের বৎসর আমরা দুই নম্বরী একটা বল কিনলাম। পাড়াতে আরো তিনটে ফুটবল ক্লাব আছে। ওদের সঙ্গে ম্যাচ দিলাম। এই শুনে অরু আপা ঠোঁট উল্টে বলল, 'একেক জন চামচিকার মতো, তোরা ফুটবল খেলবি কী? বাতাস লাগলে উল্টে পড়ে যাস। এক কাজ কর, তোদের ক্লাবের নাম দিয়ে দে-- দি রয়েল চামচিকা ক্লাব।'

রাগে আমাদের গা জ্বলে গেল। ভাবলাম, এমন খেলা দেখাব যে অরু আপা ট্যারা হয়ে যাবে। হল উল্টোটা--আমরা ট্যারা হয়ে গেলাম। একেকটা খেলা হয়, আমরা দশটা-বারোটা করে গোল খাই।

তবে এবার যাতে এ রকম না হয় সে চেষ্টা অবশ্যই করব।

আমাদের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। ম্যাচ দিয়ে দিলাম। বিরাট উত্তেজনা আমাদের মধ্যে। অরু আপা সব শুনে হাসতে হাসতে বলল, 'দি রয়েল চামচিকা ক্লাব নাকি ম্যাচ দিয়েছে। তোদের লজ্জা-শরমও নেই নাকি?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'যখন চ্যাম্পিয়ান হব, তখন বুঝবে কাকে বলে চামচিকা ক্লাব।'

'তোরা চ্যাম্পিয়ান হবি? ঘোঁড়া চালাবে বাইসাইকেল?'

'হ্যাঁ চালাব।'

'যদি চ্যাম্পিয়ান হতে পারিস, তাহলে আমি আমার মাথার চুল কেটে ফেলব। সত্যি বলছি।'

এই বলে মাথাভর্তি চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অরু আপা চলে গেল। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। আমাদের দলটা হচ্ছে সবচে খারাপ। আমরা যে লাড্ডা-গুড্ডা হব, এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। নান্টু হচ্ছে আমাদের গোলকিপার। এমনিতে সে চোখে খুব ভালো দেখে, কিন্তু যখন বল গোলের দিকে আসে--তখন নাকি সব অন্ধকার হয়ে যায়। চোখে কিচ্ছু দেখে না। আসলেই তাই। বল একদিকে আসে, সে অন্যদিকে ডাইভ দেয়।

আমাদের ব্যাকে খেলে পরিমল। বল তার পায়ে আসতেই সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। কেন এ রকম হয় কে জানে! শুকনো খটখটে মাঠ। পা পিছলানোর কোনো কথা নয়, অথচ পরিমলের কাছে বল যেতেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে যাবে।

আমরাও একই রকম, শুধু টগর খুব ভালো খেলে। ও হচ্ছে আমাদের স্ট্রাইকার। কোনোমতে ওর কাছে বল পৌঁছে দিলে গোলে বল ঢোকাবেই। এক জনের ওপর ভরসা করে কি চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায়? যায় না। ফুটবল হল এগার জনের খেলা। তবু আমরা মন্দ করলাম না। গ্রীন বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে এক গোলে জিতলাম। টগর একবার মাত্র বল পেয়েছিল। সেটা দিয়েই গোল করেছে। অরুণিমা ক্লাবের সঙ্গে ড্র হল চার-চার গোলে। আমাদের দিকের চারটা গোলই করেছে টগর। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠে গেলাম। অরু আপার মুখ শুকিয়ে গেল। যদি সত্যি সত্যি জিতে যাই, তাহলে মাথা-ভর্তি চুল কাটতে হবে।

ফাইনাল খেলার দিন শহরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আমাদের পাড়ায় এক জন নেতা আছেন। তিনি শুধু ইলেকশান করেন আর ফেল করেন। তাঁর নাম মতিন সাহেব। তিনি ফাইনাল খেলার দিন ভোরবেলা একটা শিল্ড ঘোষণা করে দিলেন--সেই সঙ্গে ফাইনাল খেলা যাতে ঠিকমতো হয় সে জন্য তিন শ' টাকা চাঁদা দিলেন। নিজেই মাইকের ব্যবস্থা করে দিলেন। সকাল থেকে রিক্সা করে মাইক বাজতে থাকল।

'ভাইসব, অদ্য বৈকাল চার ঘটিকায় আব্দুল মতিন ফুটবল শিল্ডের ফাইনাল খেলা। রয়েল বেঙ্গল বয়েজ ক্লাব একাদশ বনাম বুলেট একাদশ। উদ্বোধন করবেন অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী, জনগণের নয়নের মণি, দেশদরদী সংগ্রামী জননেতা জনাব আব্দুল মতিন ময়না মিয়া। ভাইসব—'

আমাদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। শুধু আমাদের না, উত্তেজনা বড়দের মধ্যেও। বড়চাচা আমাকে ডেকে বললেন, 'কী, তোরা পারবি তো?'

আমি হচ্ছি দলের ক্যাপ্টেন। কাজেই আমাকে বলতে হল, 'ইনশাআল্লাহ্ পারব।'

'তোরা তো খেলতে জানিস না, তোরা পারবি কী করে? একমাত্র খেলোয়াড় হচ্ছে টগর। সেই বেচারা একা কী করবে?'

'সে একাই একশ।'

মুখে বললাম ঠিকই, কিন্তু ভরসা পেলাম না। কারণ বুলেট ক্লাব বাইরে থেকে হায়ার করে তিন জন প্লেয়ার এনেছে। এক-এক জন ইয়া জোয়ান। এদের এক জনের নাম ল্যাংচু, কারণ তার কাজই হচ্ছে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়া। সেই ল্যাংও এমন ল্যাং যে প্লেয়ারের পা ভেঙে যায়। ল্যাংচু নাকি এইভাবে এর আগে তিন জনের পা ভেঙেছে। টগরের পা ভেঙে সে এক হালি পুরো করবে। কী সর্বনাশের কথা!

চারটার সময় খেলা শুরু হবে। দুটো বাজতেই টগর শুকনো মুখে এসে উপস্থিত। সে নাকি খেলবে না। আমি বললাম, 'কেন খেলবি না? ল্যাংচুর ভয়ে?'

'বুলেট ক্লাবের বগা ভাই বলেছে আমি যদি খেলি, তাহলে আমাকে ফর্দাফাই করে দেবে।'

'বগা ভাই নিজে বলেছে?'

'হুঁ।'

বগা ভাই বলে থাকলে সত্যি ভয়ের কথা। কারণ বগা ভাই বিরাট গুন্ডা। তার এতদিনে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়া উচিত। কিন্তু সে ফেল করে করে ক্লাস এইটে আটকে আছে। কাজের মধ্যে কাজ সে যা করে তা হচ্ছে বিড়ি টানে। খারাপ খারাপ কথা বলে আর আমাদের মতো অল্পবয়সী ছেলেপুলে দেখলে বিনা কারণে মারধোর করে। আমাদের ক্লাসের পুতুল একদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ি আসছে, হঠাৎ বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই বললেন, 'শুনে যা।' পুতুল দেখল পালান অসম্ভব। সে এগিয়ে এল। বগা ভাই বলল, 'পিঁপড়ার কামড় কেমন জানিস?'

'জানি।'

'উঁহু, ভালোমতো জানিস না। তবে এখন জানবি।'

এই বলেই লাল পিঁপড়ার একটা বাসা ভেঙে পুতুলের মাথায় টুপির মতো পরিয়ে দিল। ভয়াবহ অবস্থা। এই বগা ভাইয়ের কারণে টগর যে খেলবে না, তা তো জানা কথাই।

শুধু টগর না, কিছুক্ষণ পর করিম এসে বলল, সেও খেলবে না। করিম সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলে। খুব খারাপ না। টগরের মতো অবশ্যি না, তবুও ভালো।

আমি বললাম, 'তুই খেলবি না কেন? বগা ভাই কিছু বলেছে?'

'না।'

'তাহলে খেলবি না কেন?'

'ইচ্ছা হচ্ছে না, তাই খেলব না।'

এই বলেই করিম লম্বা একটা ঘাসের ডাঁটা নিয়ে চিবুতে লাগল। তার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বগা ভাই তাকেও ভয় দেখিয়েছে।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ন' জন প্লেয়ার নিয়ে কী খেলব? অরু আপা বলল, 'তোরা খেলা বন্ধ করে পালিয়ে যা। আজ মাঠে তোদের ভুলোধুনো করবে। কমসে কম দু' জনের পা ভাঙবে। এক জনের হবে কম্পাউন্ড ফ্রাকচার।'

ম্যাচে নাম দিয়ে পিছিয়ে পড়া যায় না। সাড়ে তিনটায় মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লোকে লোকারণ্য। বুলেট ক্লাবের প্লেয়াররা বল নিয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছে। তাদের সবার মুখভর্তি হাসি।

মাঠের দক্ষিণ দিকে টেবিলের উপর শিল্ড। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে চেয়ার সাজান। দেশদরদী জননেতা আব্দুল মতিন সাহেব এসে পড়েছেন। তাঁর গলায় ফুলের মালা। বগা ভাইকেও দেখলাম। খুব ফুর্তি। একটু পরপর হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে।

আমরা মুখ শুকনো করে মাঠে নামলাম। পকেটে বোতল ভূতের শিশি। আমি মনে মনে বললাম, 'ভাই বোতল ভূত। আমাদের রক্ষা কর ভাই।'

রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব বনাম বুলেট ক্লাবের ফাইনাল খেলায় এমন হুলস্থুল হবে কে ভেবেছিল? মাঠ লোকে লোকারণ্য। একটা ব্যান্ড পার্টি পর্যন্ত আছে। কিছুক্ষণ পরপর ব্যাণ্ড পার্টি বাজাচ্ছে--হলুদ বাটি, মেন্দি বাটি, বাটি ফুলের মউ। এই একটি মাত্র গানই এরা জানে। সব অনুষ্ঠানে এই গান।

ব্যান্ড পার্টি এনেছেন আব্দুল মতিন সাহেব। তাঁর কান্ডকারখানা এ রকমই। সব সময় চান লোকজনকে চমকে দিতে। যারা ইলেকশন করে তাদের নাকি এরকম করতে হয়। কোথাও লোকজন জড়ো হলে একটা ভাষণ দিতে হয়। আজও নিশ্চয়ই দেবেন।

মাইক এসেছে। রোগা একটা ছেলে কিছুক্ষণ পরপর বলছে--'হ্যালো মাইক্রফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রী ফোর। মাইক্রোফোন টেস্টিং। রোগা ছেলেটি চলে যাবার পর তার চেয়েও রোগা আরেকটি ছেলে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াল। খুব কায়দা করে বলল, 'জরুরী ঘোষণা, জরুরী ঘোষণা। ভাইসব, একটি বিশেষ ঘোষণা। অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী, জনগণের নয়নের মণি, এ যুগের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, জনাব আবদুল মতিন ময়না মিয়া এই মাত্র একটি স্বর্ণপদক ঘোষণা করেছেন। আজকের এই ফাইনাল ম্যাচের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের জন্যে এই স্বর্ণপদক। খেলার শেষে এই স্বর্ণপদক দেয়া হবে। ভাইসব, জরুরী ঘোষণা——'

এই ঘোষণায় বুলেট ক্লাবের সবার মুখে হাসি দেখা গেল। কেনই বা হাসি দেখা যাবে না? শিল্ড, স্বর্ণপদক সব তো ওরাই পাবে। আমরা হাত-পা ভেঙে বাড়ি ফিরব।

আমরা মুখ শুকনো করে মাঠে নামলাম। ব্যান্ড পার্টি বিপুল উৎসাহে বাজাতে লাগল--হলুদ বাটি, মেন্দি বাটি, বাটি ফুলের মউ।

রেফারী হচ্ছেন আমাদের স্কুলের ড্রিল স্যার--অজিত বাবু। খুব রোগা বলে আমরা তাঁর নাম দিয়েছি 'জীবাণু স্যার'।

জীবাণু স্যার আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'তোরা মাত্র ন' জন কেন? বাকি দু'জন কই?'

আমি বললাম, 'ওরা খেলবে না স্যার।'

'কেন?'

'বুলেট ক্লাবের বগা ভাই ভয় দেখিয়েছে, খেলতে নামলে পা ভেঙে দেবে।'

'বলিস কী!'

'সত্যি কথা স্যার। ওদের দলে এক জন আছে--নাম ল্যাংচু। ওর কাজই হচ্ছে ল্যাং মারা। ল্যাং মেরে পা ভেঙে ফেলা।'

'বিচিত্র না, ভাঙতেও পারে। সাবধানে খেলবি। খবরদার, চার্জ-ফার্জ করতে যাবি না।'

জীবাণু স্যার বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। খেলা শুরু হল। আমি পকেটে হাত দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললাম, 'ও ভাই বোতল ভূত, আমাদের বাঁচাও ভাই।'

কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল বগা ভাই বিদ্যুৎগতিতে বল নিয়ে আমাদের গোলপোস্টের দিকে যাচ্ছে। বদরুল তাকে আটকাতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল। কারণ ল্যাংচু তাকে পেছন থেকে ল্যাং মেরেছে। গোলপোস্টে আমাদের গোলকিপার নান্টু চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। এটাই হচ্ছে তার নিয়ম। বল নিয়ে কেউ গোলপোস্টের দিকে আসতে থাকলেই আপনাতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

বগা ভাই গোলপোস্টের প্রায় ছ'গজের ভেতর চলে এসেছে। নান্টু চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তখন একটা অঘটন ঘটল। মনে হল কেউ এক জন যেন প্রচন্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে বগা ভাইয়ের গালে। বগা ভাই থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। তার পায়ে বল, অথচ সে শর্ট দিচ্ছে না। মাঠে তুমুল হৈচৈ--'কিক দাও। কিক দাও। হাবার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, কিক দাও।'

বগা ভাই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রচন্ড কিক দিল। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! প্রচন্ড কিকের পরও বলের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হল না। বলটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় গড়িয়ে যাচ্ছে। এক সময় নান্টুর

পায়ের কাছে বলটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই দাঁড়িয়ে থাকা বলের উপর নান্টু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন ভঙ্গি করতে থাকল, যেন সে বুলেটের মতো গতির বলকে অপূর্ব কায়দায় আটকেছে।

মজা আরো জমল। বুলেট ক্লাবের যে কোনো প্লেয়ার বল নিয়ে এগিয়ে এলেই অদৃশ্য কে যেন চড় বসিয়ে দেয়।

ল্যাংচু হতভম্ব। কারণ কিছুক্ষণ পরপর সে চড় খাচ্ছে। একবার দেখা গেল সে কোমরে হাত দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। হাসি আর থামেই না। মাঠের সবাই হতভম্ব।

ড্রিল স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'এই ছেলে, তুমি এরকম করছ কেন? হাসছ কেন?'

মাঠে তুমুল হৈ চৈ--কিক দাও। কিক দাও।

ন্যাংড়ু করুণ মুখে বলল, 'কী করব স্যার বলুন—কে যেন কাতুকুতু দিচ্ছে।'

'কাতুকুতু দিচ্ছে মানে! কী বলছ তুমি?'

'সত্যি দিচ্ছে স্যার। হি হি হি। হো হো হো। হি হি হি। হিক হিক হিক।'

হাসতে হাসতে ন্যাংড়ু গড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত কাণ্ড! ওরা বলে কিক করলে বল নড়ে না। যেন পাথরের বল। বুলেট দলের ক্যাপ্টেন হচ্ছে মুশতাক। সে একবার বলে কিক করে 'উফ' করে চেঁচিয়ে উঠল। ড্রিল স্যার বললেন, 'কী হয়েছে?'

'স্যার, বল আগুনের মতো গরম। পা পুড়ে গেছে স্যার। পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে।'

'পাগলের মতো কথা বলিস না তো। বল গরম মানে!'

'আপনি হাতে নিয়ে দেখুন স্যার।'

ড্রিল স্যার বল হাতে নিয়ে বললেন, 'বল যে রকম, সে রকমই তো আছে। কী বলছিস তোরা!'

হাফ টাইমের দশ মিনিট আগে আমরা একটা গোল করে ফেললাম। আমরা গোল করলাম বলাটা ঠিক হল না। বলটা আপনা-আপনি গোলে পড়ল।

ড্রিল স্যার পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে পড়লেন। বাঁশি বাজাবেন কিনা বুঝতে পারলেন না।

হাফ টাইমের পর বুলেট ক্লাব আর খেলতে রাজি হল না। আবদুল মতিন সাহেব মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সেরা খেলোয়াড়ের স্বর্ণপদক কাকে দেবেন বুঝতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সেই স্বর্ণপদক নান্টুর কপালে জুটল। সে থেমে থাকা বল আটকানর জন্যে পেয়ে গেল স্বর্ণপদক।

আবদুল মতিন সাহেব কাঁপা গলায় একটা ভাষণ দিলেন—'রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের উজ্জ্বল প্রতিভা, অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট গোলকিপার, নান্টুর অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে দেয়া হচ্ছে

আবদুল মতিন স্বর্ণপদক। ভাইসব, হাততালি দিন। হাততালি।'

প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। সেই সঙ্গে ব্যান্ড বেজে উঠল—হলুদ বাটি, মেন্দি বাটি, বাটি ফুলের মউ—।

অরু আপা বলেছিল—আমাদের রয়েল বেঙ্গল ফুটবল টিম চ্যাম্পিয়ান হলে সে তার মাথার চুল কেটে ফেলবে। এসব হচ্ছে কথার কথা। আমরা সব সময় বলি। ঐ তো সেদিন আমাদের ক্লাসের মনসুর বলল—সে যদি এক জগ পানি এক চুমুকে খেতে না পারে, তাহলে তার নাম বদলে ফেলবে। আধ জগ খাবার পর চোখটোখ উল্টে এক কাণ্ড। তার জন্যে তো তার নাম বদলান হয় নি।

কিন্তু অরু আপা সত্যি সত্যি তার মাথার চুল কেটে ফেলল। আমার মা খুব শান্ত ধরনের মহিলা। সহজে রাগটাগ করেন না। তিনি পর্যন্ত রেগে ভূত। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে বললেন, 'কেন চুল কাটলি?'

অরু আপা সহজ গলায় বলল, 'বাজিতে হেরেছি, তাই চুল কাটলাম।'

'এত সুন্দর চুল কাটতে একটু মায়াও লাগল না?'

'না, লাগল না।'

'তুই কি পাগল হয়ে গেলি?'

'না, হই নি, তবে এখন তোমার চিৎকারে পাগল হব।'

চুল কাটায় অরু আপাকে কী যে বিশ্রী দেখাচ্ছিল বলার নয়। তাকে দেখাচ্ছিল ছেলেদের মতো। আমার কাছে মনে হল অরু আপা চুল না কাটলেও পারত। আমরা চ্যাম্পিয়ান হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে বোতল ভূতের জন্যে। সে সাহায্য না করলে সবার সাথে ছ'সাত

গোলে হারতাম। কাজেই এই জেতায় ফাঁকি আছে। ফাঁকির খেলার কারণে বেচারী অরু আপার সব চুল চলে যাবে তা কি ঠিক?

অরু আপা অবশ্যি বোতল ভূতের কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না। সে সায়েন্স পড়ে তো, তাই। সায়েন্স পড়লে সব কিছু অবিশ্বাস করতে হয়। সেদিন বাসায় মন্টু ভাই এসেছিলেন। তিনি বই-টই পড়ে হাত দেখা শিখেছেন। সব সময় তাঁর পকেটে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকে। কেউ যদি হাত দেখাতে চায় অমি উনি গম্ভীর মুখে বসে যান। ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে কী সব দেখেটেখে টেনে টেনে বলেন, 'বৃহস্পতির ক্ষেত্রটা ভালো মনে হচ্ছে না। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে যব চিহ্ন আছে। প্রচুর অর্থ লাভ হবে।'

মন্টু ভাই এমন ভাবে কথা বলেন যে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। আর মনে হয় তিনি যা বলছেন সবই সত্যি। সেই মন্টু ভাইয়ের ম্যাগনিফাইং গ্লাস অরু আপা একদিন নর্দমায় ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনি এইসব অবৈজ্ঞানিক কথা আর বলবেন না তো মন্টু ভাই। খুব রাগ লাগে।'

মন্টু ভাই আহত গলায় বললেন, 'দুই পাতা বিজ্ঞান পড়ে এই কথা বলছিস? শেক্সপীয়ার কী বলেছেন জানিস? তিনি বলেছেন--দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন এ্যান্ড আর্থ।'

'তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না বলে বলেছেন।'

'আর তুই বুঝি বিরাট সাইন্টিস্ট?'

দু' জনে বিরাট তর্ক বেধে গেল। শেষমেষ রাগ করে মন্টু ভাই চলে গেলেন।

অরু আপার স্বভাবই হচ্ছে এই, সবার সঙ্গে তর্ক করবে। কোনো কিছু বিশ্বাস করবে না। চোখের সামনে বোতল ভূতের কান্ডকারখানা দেখেও বলছে ভূত বলে কিছু নেই। এবং সে নাকি তা প্রমাণ করে দিতে পারে। বোতলের ভেতর নাকি আছে শুধু বাতাস।

শেষে রাগ করে একদিন বললাম, 'বেশ প্রমাণ কর যে বোতলে কিছু নেই। তবে তুমি কিন্তু বোতলের মুখ খুলতে পারবে না।'

'বেশ খুলব না।'

'প্রমাণটা করবে কীভাবে?'

অরু আপা গম্ভীর হয়ে বলল, 'খুব সোজা প্রমাণ। ওজন করে প্রমাণ করব। সব জিনিসেরই ওজন আছে। ভূত বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তারও ওজন থাকবে। এবং যত তার বয়স বাড়বে, ততই তার ওজন বাড়বে। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে বড় হচ্ছে। আমি যা করব তা হচ্ছে কলেজের ল্যাবরেটরির যে ওজনযন্ত্র আছে তা দিয়ে বোতলটার ওজন সাত দিন পরপর মাপব। যদি দেখা যায় বোতলটার ওজন বাড়ছে না, তাহলে বুঝতে হবে ভূত-প্রেত কিছু এই বোতলের মধ্যে নেই।'

প্রথম সপ্তাহে ওজন হল সত্তের দশমিক চার সাত তিন গ্রাম। পরের সপ্তাহে ওজন বাড়ার বদলে খানিকটা কমে গেল। ওজন হল সত্তের দশমিক চার সাত এক গ্রাম। এর পরের সপ্তাহে হল সত্তের দশমিক চার ছয় শূন্য গ্রাম। অরু আপার মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ার বদলে ওজন কমছে। তা তো হবার নয়। আমি বললাম, 'ভূতদের বেলায় নিয়ম হয়তো অন্য। তারা যতই বড় হয় ততই তাদের ওজন কমে।'

অরু আপা বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাজে বকিস না।'

'তাহলে তুমিই বল ওজন কমছে কেন?'

'ওজন নেবার যন্ত্রটা হয়তো ভালো না। এবার অন্য একটা যন্ত্রে ওজন নেব।'

'বেশ নাও। সাবধান, বোতল যেন না ভাঙে।'

আবার ওজন নেয়া শুরু হল। এবার দেখা গেল ওজন বাড়ছে। অরু আপার খুব মেজাজ খারাপ। আমি বললাম, 'ভূতদের ওজন হয়তো বাড়ে, আবার কমে। আবার বাড়ে, তারপর আবার কমে।'

অরু আপা ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'বোকার মতো কথা বলিস না তো। বোকার মতো কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।'

'তুমি তাহলে আমাকে বল, ওজন বাড়ছে কমছে কেন?'

'কোথাও কোনো ভুল করছি, তাই এরকম হচ্ছে।'

'কী ভুল করছ?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

অরু আপা আরো কী সব পরীক্ষা করল। বোতল এক সপ্তাহ অন্ধকারে রেখে তারপর ওজন। আলোতে রেখে ওজন। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। ফ্রীজে রেখে ঠান্ডা করে ওজন নিলে এক রকম ওজন হয়, আবার গরম করলে অন্য রকম ওজন হয়। শেষটায় অরু আপা রাগ করে বলল, 'তোর এই বোতল নিয়ে বিদেয় হ। শুধু শুধু সময় নষ্ট।'

অরু আপার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটা লাভ হল। সবাই জেনে গেল বোতল ভূতের ব্যাপারটা। নিতান্ত অপরিচিত লোকও পথের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই যে খোকা, তোমার কাছে বোতলের ভেতর নাকি কী আছে? দেখি জিনিসটা।'

আমি হাসিমুখে দেখাই। খুব গর্ব বোধ হয়। ভূত পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান তো খুব সহজ ব্যাপার না। হেড স্যার পর্যন্ত এক দিন বললেন, 'দেখি জিনিসটা?'

সব ভালো দিকের একটা খারাপ দিকও আছে। একদিন খারাপ দিকটা স্পষ্ট হল। স্কুল থেকে ফিরছি, কালীতলার মন্দিরটার কাছে বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই থমথমে গলায় বলল, 'বের কর।'

'কী বের করব?'

'ভূত বের কর। না বের করলে কাদার মধ্যে পুঁতে ফেলব। তার আগে এমন একটা চড় দেব যে বত্রিশটা দাঁত তো পড়বেই, জিব পর্যন্ত পড়ে যাবে।'

আমি বোতল বের করলাম। বগা ভাই সেই বোতল টপ করে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'আর কোনো কথা না, সোজা বাড়ি চলে যা। একটা কথা বলেছিস তো ছয় নম্বুরী ধোলাই দিয়ে দেব। ছয় নম্বুরী ধোলাই কাকে বলে জানিস?'

আমি জানতাম না। জানার ইচ্ছাও হল না। বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রাগে-দুঃখে আমার চোখে পানি এসে গেছে। পুরুষ মানুষের চোখে পানি আসা খুব খারাপ, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পানি

সামলাতে পারছি না। টপটপ করে পানি পড়ছে।

বোতলভূত হাতছাড়া হওয়ায় আমাদের বাড়ির সবাই খুব খুশি। বড়চাচা বললেন, 'বাঁচা গেল, আপদ বিদায় হয়েছে।' আমার বাবা বললেন, 'এইসব আজেবাজে জিনিস বাড়িতে না থাকাই ভালো।' অরু আপা মুখ বাঁকা করে বললেন, 'একটা কুসংস্কার বাড়ি থেকে গেছে, এটা একটা সুসংবাদ।'

আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে রোজ একবার করে বলি, 'ও ভাই বোতল ভূত, ফিরে এস। বগা ভাইয়ের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি দয়া করে নিজে নিজেই চলে এস।'

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হয় বোতল ভূত হয়তো নিজে নিজেই চলে এসেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করি, কিচ্ছু নেই।

এদিকে বগা ভাইয়ের উপদ্রপ খুব বেড়েছে। রয়েল বেঙ্গল ক্লাবের যাকেই সে দেখে তার কপালে অনেক যন্ত্রণা। এক দিন মুনিরকে ধরে ধোলাই দিয়ে দিল। বেচারা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল--বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই হাত ইশারা করে ডাকল। মুনির না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে--বগা ভাই দৌড়ে এসে শার্টের কলার চেপে ধরল। কড়া গলায় বলল, 'কী, চোখে দেখতে পাস না? চড় খেতে কেমন মজা দেখবি? এই দেখ।'

'শুধু শুধু মারছেন কেন?'

'ইচ্ছে হচ্ছে মারছি। মেরে ভর্তা বানিয়ে দেব--আলু ভর্তা।'

এই বলে মুনিরের হাত থেকে অঙ্ক বই টেনে নিয়ে কুচিকুচি করে

তো শিয়ালের শিং দেখিয়ে দেব। শিয়ালের শিং কখনো দেখেছিস?'

'টাকা ফেরত দাও।'

'আরে, আবার টাকা ফেরত চায়। শখ তো কম না।'

বগা ভাই উঠে এসে একটা চড় বসিয়ে দিল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। মুনির বলল, 'আমি স্যারদের বলব।'

'যা বলে আয়। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা।'

বলতে বলতে বগা ভাই মুনিরের পেটে একটা ঘুসি দিল। মুনির কোঁক করে একটা শব্দ করে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

'দু' জনে এবার গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে থাক। আমরা চললাম।'

আমি এবং মুনির অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

দু' জনই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছি, তখনি মজার ব্যাপারটা ঘটল। চোখ মোছার রুমালের খোঁজে পকেটে হাত দিতেই হাতে ঠান্ডা কী যেন লাগল। বের করে দেখি বোতলভূত। সে চলে এসেছে।

আমি এবং মুনির দু'জনেই গলা জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। এবারের কান্না সুখের কান্না।

বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মাস কোনটা?

ডিসেম্বর। পরীক্ষার মাস। এই মাসটা না থাকলে কেমন হত? সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর তারপর জানুয়ারি। মাঝখানের ডিসেম্বরটা নেই। বোতল ভূতকে বললে হয় না? নিশ্চয়ই হয়। সে কিছু একটা করবেই--কিন্তু তাকে বলা যাচ্ছে না। কারণ বড়চাচা 'বোতল ভূত'

স্টীলের আলমিরায় বন্দি করে রেখেছেন। ফাইনাল পরীক্ষার আগে তাকে হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পরীক্ষার পরেও যে পাব সে আশাও খুবই ক্ষীণ। এ রকম কেন হল সেটা আগে বলে নিই।

আমাকে আর অন্তুকে পড়ানর জন্য নতুন এক জন স্যার রাখা হয়েছে, মজিদ স্যার। এই স্যারের চেহারাটা খুব ভালোমানুষের মতো, কিন্তু মেজাজ আগুনের মতো। বাড়িতে ঢুকেই বিনা কারণে একটা হুংকার দেন। তারপর বলেন--'হোমটাস্কের খাতা আর বেতটা বের কর। কত ধানে কত চাল আগে হিসাব নিয়ে নেই।' আমরা ভয়েভয়ে হোমটাস্কের খাতা বের করি। পরবর্তী আধ ঘন্টা আমাদের ওপর দিয়ে বড় ধরনের একটা সাইক্লোন বয়ে যায়। আমরা কান্নাকাটিও করি। তাতে লাভ হয় না। বড়চাচা হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'ভালো মাষ্টার দিয়েছি। এইবার টাইট হচ্ছে। মাষ্টার আরো টাইট দাও। আরো।' উৎসাহ পেয়ে মজিদ স্যার আরো টাইট দেন। আমরা চোখে অন্ধকার দেখি।

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে অন্তু যা করল তা মোটেই দোষের নয়। দু'লাইনের একটা কবিতা লিখল,

'মজিদ স্যার মজিদ স্যার
চোখে দেখি অন্ধকার।'

কবিতা লিখেই সে থামল না। আমার কাছ থেকে বোতল ভূত কিছুক্ষণের জন্যে ধার করে নিয়ে চলে গেল ছাদে। তারপর খুব করুণ গলায় বোতল ভূতকে বলল, 'ও আমার প্রিয় ভূত, ও আমার লক্ষী ভূত, ও আমার ময়না ভূত, তুমি মজিদ স্যারের পা ভাঙার একটা ব্যবস্থা করে দাও ভাই। যাতে সে আর আমাদের পড়াতে আসতে না পারে।'

অন্তু লক্ষ করে নি যে বড়চাচা ছাদের এক কোণায় সারা গায়ে অলিভ অয়েল মেখে রোদ তাপাচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি মেঘগর্জন করলেন, 'অন্তু এদিকে আয়।'

অন্তু এগিয়ে গেল।

'বোতলটা আমার কাছে দে।'

অন্তু বোতল নিল।

'কানে ধর।'

অন্তু কানে ধরল। বড়চাচা বললেন, 'শকুনের বদদোয়ায় গরু মরে না, বুঝলি। যদি মরত--দেশের সব গরু মরে সাফ হয়ে যেত। বুঝতে পারলি?'

'জ্বি বুঝতে পারছি।'

'কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আর আমি মজিদ মাস্টারকে খবর পাঠাচ্ছি সে যেন আজ থেকে দু'বেলা আসে। সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার। যে রোগের যে দাওয়াই।'

মজিদ স্যারকে খবর পাঠাতে হল না। তাঁর বাড়ি থেকে খবর এসে পড়ল--কিছুক্ষণ আগে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে তাঁর পা ভেঙে গেছে। বড়চাচা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোতল ভূতকে স্টীলের আলমিরায় তালাবদ্ধ করে রাখলেন। চাবি সব সময় তাঁর কোমরে কালো সুতোর সঙ্গে বাঁধা। সেই চাবি হাতে পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।

অথচ এই মুহূর্তে বোতল ভূতকে আমাদের খুবই দরকার। না, আমাদের পরীক্ষার জন্যে নয়। পরীক্ষা যা হবার হবে। হয়তো ফেল করব। সেটাও ভালো। ফেল করলে রবীন্দ্রনাথ হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। যারা সব পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হয় তারা কবি-সাহিত্যিক হতে পারে না। নিয়ম নেই।

বোতল ভূতটা আমাদের দরকার পাশ-ফেলের জন্যে নয়, অরু আপার জন্যে। অরু আপার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে।

বড়চাচাই ব্যবস্থা করছেন। তাঁর মতে--মেয়েগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হয়, আর ছেলেগুলোকে দেরিতে। তাহলেই সংসার সুখের হয়। অরু আপার বিয়ে করার মোটেও ইচ্ছা নেই। সে খুব কান্নাকাটিও করছে। বড়চাচা বলেছেন, 'কেঁদে লাভ হবে না। আজ হোক কাল হোক বিয়ে তো করতেই হবে। আজ হলেই ক্ষতি কী?'

এক দিন চার-পাঁচ জন ইয়া মোটা মোটা মহিলা এসে অরু

আপাকে দেখে গেল। তাদের কী সব প্রশ্ন--

'গান বাজনা জান?'

'সেলাই জান?'

'রান্না-বান্না কিছু শিখেছ?'

'কোরান শরীফ পড়তে পার?'

'বেতেরের নামাজ কয় রাকাত বল তো?'

অরু আপা দিন-রাত কাঁদে। তার কত ইচ্ছা সে পড়াশোনা শেষ করে জাহাজে করে সারা পৃথিবী ঘুরবে। বেচারীর জন্যে আমাদেরও খুব মন খারাপ। অরু আপা চলে গেলে বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে। আমরা ঝগড়া করব কার সাথে? হাসি তামাশাই-বা করব কার সাথে?

শেষটায় যেদিন 'পান-চিনি' হবে, সেই দিন কোনো উপায় না দেখে স্টীলের আলমিরায় মুখ লাগিয়ে বললাম, 'বোতল ভূত ভাই, একটা উপায় কর। কোনো কথা শুনব না। উপায় তোমাকে করতেই হবে। এটা যদি করে দাও, তাহলে আগামী তিন মাস তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কথা দিচ্ছি। এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।'

পান চিনি উপলক্ষে অরু আপাকে সাজান হচ্ছে। সাজাচ্ছেন আমার মেজ মামী। আমরা দূরে বসে দেখছি। কাজল পরানর সময় তিনি হঠাৎ অবাক হয়ে বললেন, 'তোর চোখগুলি এমন ফোলা ফোলা লাগছে কেন? মনে হচ্ছে ব্যাঙের চোখ!'

অরু আপা উত্তর দিল না। আমরা দেখলাম সত্যি তাই। চোখ দু'টি যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে। সাজান শেষ হবার পর সবার চোখ কপালে উঠে গেল। কী কুৎসিত যে দেখাচ্ছে! তাকান যাচ্ছে না। আমার মা বিরক্ত হয়ে মেজ মামীকে বললেন--'এটা কী রকম সাজ হল?' মেজ মামী বললেন, 'কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। অসুবিধা নেই, আবার সাজান হবে।' এবার আরো বিশ্রী হল। মনে হচ্ছে নীল শাড়ি পরে একটা বুড়ো বাঁদর বসে আছে। অথচ অরু আপা পরীর মতো সুন্দর।

তৃতীয়বার সাজানর সময় ছিল না। পাত্রপক্ষ এসে গেছে। অরু আপাকে তাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। তারা ভূত দেখার মতো

চমকে উঠল। এক জন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

অরু আপা অবিকল বানরদের মতো কিচকিচ করে বলল, 'জাহানারা।' নিজের গলা শুনে সে নিজেই অবাক।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বড়চাচা বারান্দায় গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। একবার শুধু বললেন, 'ব্যাপারটা কী হয়েছে আমি বুঝতে পারছি।'

আমরাও খুব ভালোমতো বুঝতে পারছি। আমাদের আনন্দের সীমা নেই। কারণ বিয়ে ভেঙে গেছে। বরপক্ষের লোকজন চলে গেছে। অরু আপা হাসছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে!

এক চৈত্র মাসে 'বোতল ভূত' এনেছিলাম--এখন আরেক চৈত্র মাস। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। কত কাণ্ড হল 'বোতল ভূত' নিয়ে। সে হয়ে গেল আমাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু। কোনো একটা সমস্যা হলেই 'বোতল ভূতের' কাছে যাই। কাতর গলায় সমস্যার কথা বলি--

'ও ভাই বোতল ভূত, লক্ষী সোনা, চাঁদের কণা-- ছয় প্রশ্নমালার তিন নম্বর অঙ্কটা পারছি না। একটু দেখবে, কিছু করা যায় কিনা?'

'ও ভাই বোতল ভূত, আজ ইংরেজি পড়া শেখা হয় নি। তুমি কি দয়া করে ইংরেজি স্যারের অসুখ বানিয়ে দেবে?'

'আজ মগনা পাড়ার বদমাশ ছেলেগুলির সাথে আমাদের একটা মারামারি আছে। তুমি কি দয়া করে আমাদের জিতিয়ে দেবে?'

এই জাতীয় আবেদনে সব সময় যে কাজ হয় তা না, তবে বেশির

ভাগ সময়েই হয়। সাধারণত খুব জটিল সমস্যায় 'বোতলভূত' আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই যেমন অরু আপার বিয়ে ভাঙার ব্যাপারটাই ধরা যাক না। কেমন চট করে ভেঙে গেল। 'বোতলভূত' হাতের কাছে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আমি ঠিক করলাম এক বছর পার হলেই বোতলভূতের জন্মদিন করা হবে। বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলব। এক টাকা করে চাঁদা ধরা হবে। সারাদিন খুব হৈচৈ করা হবে। আমাদের ক্লাসের মন্টুকে বলা হবে এই উপলক্ষে একটা কবিতা লেখার জন্যে। মন্টু হচ্ছে আমাদের ক্লাসের কবি। সে এ পর্যন্ত তিন শ' এগারটা কবিতা লিখেছে। এর মধ্যে কয়েকটা অতি বিখ্যাত। যেমন আমাদের অঙ্ক স্যারকে নিয়ে লেখা কবিতা--''বিভীষিকা''।

''ঐ আসছে অঙ্ক স্যার
চক্ষে দেখছি অন্ধকার
হব আমরা পগার পার।।''

গায়কদের গান গাইতে বললে তারা সব সময় বলে-- আজ আমার গলা ভেঙে গেছে, মুড নেই, ইচ্ছা করছে না ইত্যাদি। কবিদের বেলায় ভিন্ন ব্যাপার। তাদের কবিতা লিখতে বললেই খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়ে। মন্টুও তাই করল। টিফিন টাইমের মধ্যে ছ'পাতার কবিতা লিখে ফেলল। কবিতার শিরোনাম--''ওগো প্রিয় বন্ধু।''

কবিতা শুনে আমরা মুগ্ধ। আমাদের ধারণা হল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলায় এত ভালো কবিতা লেখেন নি। আমরা মন্টুকে 'মহাকবি' টাইটেল দিয়ে দিলাম। ঘোষণা করে দেয়া হল এখন থেকে মন্টুকে শুধু মন্টু বললে কঠিন শাস্তি হবে। মন্টুকে ডাকতে হবে 'মহাকবি মন্টু।'

বোতলভূতের জন্মদিনের ব্যাপারেও সবার খুব আগ্রহ দেখা গেল। শুধু আমাদের ক্লাসেরই না, অন্য ক্লাসের ছেলেরাও চাঁদা নিয়ে উপস্থিত। তারাও জন্মদিন করতে চায়। ক্লাশ ফাইভের ছেলেরা এসে বলল, তারা বোতলভূতকে একটা সংবর্ধনা দিতে চায়। ক্লাশ সিক্সের ছেলেরা এসে বলল, তারাও সংবর্ধনা দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল স্কুলের

তরফ থেকেই তাকে একটা সংবর্ধনা দেয়া হবে। সেই উপলক্ষে কমিটি তৈরি হল। মানপত্র লেখা হল। মানপত্র লিখলেন ক্লাশ টেনের আবু বকর ভাই। চমৎকার মানপত্র--হে ভূত, হে অশরীরী প্রাণ, হে বোতলবন্দি মুক্তহৃদয়, হে মহাপ্রাণ--এইসব লেখা। পড়লে রক্ত গরম হয়ে যায়।

আমরা ঠিক করলাম বোতলভূতের সংবর্ধনায় যার কাছ থেকে ভূত পেয়েছি তাকেই সভাপতি করা হবে। ঐ যে রবি ঠাকুরের মতো দেখতে বুড়োকে। উনি হয়ত আসতে চাইবেন না-- না চাইলেও তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে রাজি করাতেই হবে। এক দিন বিকেলে দলবেঁধে গেলাম তাঁর কাছে।

তাঁর বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। সব কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। বাড়ি রঙ করা হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' লেখা সাইনবোর্ডটি নেই। সুন্দর একটা বাগান করা হয়েছে বাড়ির সামনে।

ফসামিতো এক জন বৃদ্ধ গেঞ্জি গায়ে খুরপি হাতে বাগানে কাজ করছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'উনি কি আছেন?'

বৃদ্ধ হাসি মুখে বললেন, 'উনিটা কে?'

'ঐ যে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে। লম্বা দাড়ি। লম্বা চুল।'

বৃদ্ধ হেসে ফেললেন। আর তখনি বুঝলাম উনিই সেই লোক। দাড়ি কেটে ফেলেছেন। চুল ছোট করে ফেলেছেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বৃদ্ধ বললেন-- 'কী ব্যাপার বল তো?'

'তার আগে বলুন--আপনিই কি উনি?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই মানুষ।'

আমরা বোতলভূতের ব্যাপারটা তাঁকে বললাম। বোতলভূত আমাদের জন্যে কী কী করেছে তাও বললাম। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁকে দেখে মনে হল এমন অদ্ভুত কথা তিনি তাঁর জীবনে শোনেন নি। হতভম্ব হয়ে যাওয়া স্বরে তিনি বললেন, 'আমিই তোমাকে বোতলভূত দিয়েছি!'

'জ্বি।'

'কী সর্বনাশের কথা! আমি ভূত পাব কোথায় যে তোমাকে

বোতলে ভরে দেব?'

'এই তো দেখুন না। আমার সঙ্গেই আছে।'

আমি শিশিটা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি গভীর আগ্রহে শিশি নেড়ে-চেড়ে দেখে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে তোমাদের বলি। আমার মাথার ঠিক ছিল না। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলাম। চিকিৎসা চলছিল। এখন মনে হচ্ছে মাথা খারাপ অবস্থায় ওসব করেছি।'

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

বৃদ্ধ বললেন, 'তোমরা যে সময়ে জন্মেছ তার অনেক আগেই চাঁদে মানুষ নেমে গেছে। মঙ্গল গ্রহে নেমেছে 'মেরিনার-মহাশূন্যযান'। আর তোমরা কিনা ভূত নিয়ে মাতামাতি করছ! আমার না হয় মাথা খারাপ, কিন্তু তোমাদের তো আর মাথা খারাপ হয় নি? তোমরা কেন এসব বিশ্বাস করবে?'

আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, 'বোতলভূত আমাদের জন্যে অনেক কিছু করেছে।'

'কী করেছে?'

আমরা একে একে ভূতের কাণ্ডকারখানা বললাম। বৃদ্ধ মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, 'এইসব ঘটনা এম্নিতেও ঘটত। স্বাভাবিক নিয়মে এ সব ঘটেছে, আর তোমরা ভেবেছ ভূত এসব করেছে।'

আমাদের মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বললেন, 'মানুষের অসীম ক্ষমতা। অসাধ্য কাজের জন্যে মানুষের ভূতের দরকার হয় না। সে নিজেই পারে।'

এই বৃদ্ধের কথা শুনে আমাদের এতই মন খারাপ হল যে প্রায় চোখে পানি এসে পড়ার মতো অবস্থা। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখেই হয়তোবা বৃদ্ধের মায়া হল। তিনি বললেন, 'তোমরা ভূতের সংবর্ধনার আয়োজন করেছ--খুব ভালো কথা। কর। আমি সভাপতি হিসেবে সেখানে যাব। অবশ্যই যাব। কিন্তু কথা দিতে হবে, সভার শেষে বোতলটা আমাকে দিয়ে দেবে। কী, কথা দিচ্ছ?'

আমরা চুপ করে রইলাম।